মানাযিলে মা'রিফাত

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

মানাযিলে মা’রিফাত

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনার একটি অঙ্গসংগঠন

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

মানাযিলে মা'রিফাত

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

প্রিয় পাঠক! ইলমে তাসাওউফের ওপর রচিত এ বইটি নিজে পাঠ করুন ও অপরকে পাঠ করতে বলুন। দ্বীনের দাওয়াতে শরীক হোন। নিচে দেওয়া লিংটি ফেইসবুক, টুইটার, ই-মেইল ইত্যাদি দ্বারা যেভাবেই পারেন অপরের নিকট পৌঁছুয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই লিংকের ওয়েভপেইজে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পাবেন। চাইলে পিডিএফ (ইমেজ) ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন কিংবা অনলাইনে পাঠ করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর নৈকট্যশীল বান্দা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন।

-গ্রন্থকার

https://archive.org/search.php?query=Engineer%20Azizul%20Bari

সূচিপত্র

প্রারম্ভ	৪
প্রকাশকের আরজ	৫
মানুষ ও গাফলতি	৬
সাত মনযিলের পরিচিতি	৮
সাত মনযিলের বর্ণনা	১১
প্রথম মনযিল ঃ নফসে আম্মারা (নির্দেশ প্রাধানকারী নিজ)	১১
দ্বিতীয় মনযিল ঃ নফসে লাওয়ামাহ (ধিক্কার প্রধানকারী নিজ)	১৯
তৃতীয় মনযিল ঃ নফসে মুলহিমাহ (প্রেরণাপ্রাপ্ত নিজ)	২৪
চতুর্থ মনযিল ঃ নফসে মুতমায়িন্নাহ (সন্তুষ্ট নিজ)	৩০
পঞ্চম মনযিল ঃ নফসে রাদ্বিয়্যাহ (সদারাজী নিজ)	৩৩
ষষ্ঠ মনযিল ঃ নফসে মারদ্বিয়্যা (রাজীপ্রদত্ত নিজ)	৩৫
সপ্তম মনযিল ঃ নফসে সাফিয়্যাহ (পবিত্র নিজ)	৩৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রারম্ভ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। যিনি অনুগ্রহ করে ইলমে মা'রিফাতের উপর এই লেখাটুকু রচনার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তাঁর পবিত্র দরবারে তাওফিক ও সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর আহলে আওলাদ, আসহাব ও বন্ধুজনদের প্রতি।

ইলমে তাছাওউফের প্রত্যেক সালিককেই সাতটি স্তর বা মনযিল অতিক্রম করে যেতে হয়। এটা ইলমে মা'রিফাতের সর্বজনবিদিত একটি সত্য। তবে হ্যাঁ, কেউ হয় খুব শীঘ্র এসব স্তর বা স্টেশন অতিক্রম করেন, আবার অনেকে হয়তো অনেকদিন একেকটি স্টেশনে পড়ে থাকেন। এমনকি এটাও সম্ভব, যে কোনো বিশেষ স্তরে উপনিত হয়ে হয়তো কেউ আর অগ্রসর হতে পারেন নি। বাস্তবে শেষোক্ত কথাটিই বেশিরভাগ সালিকদের বেলা সত্য।

ইলমে মা'রিফাতের এ ৭টি মনযিল বা অবস্থা মূলত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের গ্রেডের মতো। প্রতিটি গ্রেড একে একে সফলভাবে অতিক্রমের পরই ডিগ্রি লাভ সম্ভব। তবে ইলমে তাছাওউফের ক্ষেত্রে কে কোন্ স্তরে পৌঁছেছেন তা নির্দিষ্টভাবে বলার অধিকার শিক্ষক থেকেও উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে।

গ্রেডে পাশ বা ফেল করার ব্যাপারটি সময় সময় বাস্তব স্বপ্নের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। তরীকতের মুর্শিদ তাঁর মুরীদের এসব স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে, তাকে যথাযথ দিকে ধাবিত করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন মুরীদ কোন্ স্তরে উপনিত হয়েছেন। তবে সালিক তার নিজের স্তর সম্পর্কে নিজেই অবগত হতে পারেন। আর এ ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে তো অবশ্যই নিজের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সর্বদা নিজের অবস্থার ব্যাপারে তাকে ওয়াকিফহাল থাকা তরীকতের এক বড় শিক্ষা।

তবে বই-পুস্তক পাঠ করে এসব স্তরের সঠিক রূপ সম্পর্কে অবগত থাকাটাও বেশ সহায়ক। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইলমে মা'রিফাতের মৌলিক ৭টি মনযিল সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাকে তাওফিক দিন। আ-মিন।

-গ্রন্থকার

মানুষ ও গাফলতি

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

-"কসম যুগের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।" [সূরা আ'ছর : ১-৩]

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সর্বোচ্চ আখলাক ও আত্মশুদ্ধির ক্ষমতা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কারণ তিনি তাঁর পবিত্র গুপ্তধন বান্দাকে দান করেছেন যাতেকরে তাঁর পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই আল্লাহর রহস্য-জগতের গুপ্তধনের প্রকাশ ঘটবে। সুতরাং তাকে তিনি সেরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। এই ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য হেতু আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্য, এই পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার রহস্য ইত্যাদি থেকে গাফিল হয়ে পড়ে আছি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অগুনতি মানুষ এই গাফিলতির বেড়াজালে পড়ে থাকাবস্থায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নিজেকেই চিনতে পারে নি! কোথায় থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া এবং কী উদ্দেশ্যে তার আগমন- এসব ব্যাপারে সে গাফিল থেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে পুরোদমে মনভুলা মানবগোষ্ঠীকে সঠিক গাইডলাইন হিসেবে দান করেছেন তাঁর নিজস্ব পবিত্র কথা- ঐশী গ্রন্থসমূহ। এসাথে পাঠিয়েছেন তাঁর অসংখ্য আপনজন- নবী, রাসূল, গাউস, কুতুব, আউলিয়া। এরা সঠিক পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে পথভুলা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন এবং আসছেন। যাঁরা তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তা

সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন তাঁরাই হয়েছেন কামিয়াব। এদের ব্যাপারেই প্রভুর প্রতিশ্রুতি, আমরা যদি তাঁর দিকে এক পা অগ্রসর হই তাহলে তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসবেন। অর্থাৎ সাধনার ফল হবে পবিত্র নৈকট্য।

মানুষের মধ্যে দু'ধরনের মৌলিক আত্মা বিরাজ করে। এর একটি হচ্ছে রূহুল হাইওয়ানী আর অপরটি রূহুল ইনসানী। প্রথমটি জীবাত্মা ও দ্বিতীয়টি মানবাত্মা। জীবাত্মা সৃষ্ট- সূক্ষ্ম জিনিস যা জীবন, মন, ইন্দ্রিয়, ভাব, ইচ্ছা ও দেহের গতিমতি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের অস্তিত্ব যা এই জীবাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত তার নাম হলো 'জীবী', যাকে আমরা 'আপন' বলি। এর মূলে আছে নফসে আম্মারা নামক এক জীবনী শক্তি। এর কাজ হলো আমাদেরকে জাগতিক সবকিছুর দিকে ধাবিত রেখে প্রভু থেকে দূরে সরানো। এক-কথায়, নফসে আম্মারা ও শয়তান মিলে সর্বদা আমাদেরকে গ্বাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া যাকিছু) মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে তৎপর আছে। এই নফসে আম্মারাই হলো ইলমে মা'রিফাতের সাতটি মনযিলের সর্বপ্রথম মনযিল।

এবার সবগুলো মনযিল একত্রে লিপিবদ্ধ করছি। পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য এখানে উল্লেখ্য যে, নফস হচ্ছে মানুষের একেকটি অবস্থার নাম। একেক অবস্থায় একেক ধরনের 'আপন' - [ইংরেজীতে 'সেলফ'] প্রভাবশালী হয়। ইলমে তাছাওউফে এই একেকটি অবস্থার একেক ধরনের যিকির-আযকার আছে যার মাধ্যমে এসব অবস্থার স্বরূপ মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ, মানুষ তার নিজেকে সঠিকভাবে চিনতে সক্ষম হয়।

من عرف نفسه فقد عرف ربه

মান আ'রাফা নাফসাহু
ফাক্বাদ আ'রাফা রাব্বাহু।

যে চিনতে পেরেছে নিজেকে
সে জানতে পেরেছে তার প্রভুকে।

সাত মনযিলের পরিচিতি

১. নফসে আম্মারা [নির্দেশ প্রাধানকারী নিজ] ঃ এটার কাজ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে (গ্বাইরুল্লাহর) সেদিকে মানুষকে ধাবিত করা। এটা জীবাত্মার অন্তর্ভুক্ত এক বিরাট শক্তিশালী জিনিস।

আমার ঘৃণা 'আমার' [নফসে আম্মারা] প্রতি
তথাপি 'আমি' [নফসে আম্মারা] ছাড়া হয়ে যাবে আমার ইতি!
'আমি' [রূহ] ও 'আমার' [নফসে আম্মারা] মধ্যে সদা টানাটানি,
'আমি' কে 'আমি' জানি না, অজানা-জানায় কতো হানাহানি!

২. নফসে লাওয়ামাহ [ধিক্কার প্রধানকারী নিজ] ঃ নফসে আম্মারা যখন গাফলতি ও আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো কোনো কিছুর দিকে ডাক দেয় তখন এই নফস তা শ্রবণ করে ও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই নফসের কাজই হলো জাগতিক অহেতুক ও গোণাহের কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টায় রত থাকা।

আমি যখন প্রস্তুত পাড়ি জমাতে দূর্গম সে পথে
কে সে 'আপন' [নফসে আম্মারা] সেজে ডাক দেয় পেছনে ফেরাতে।
আমাকে উদ্যম যোগাতে এলো এক হিতাকাঙ্ক্ষী 'আমি' [নফসে লাওয়ামাহ],
সে ছিলো নিদ্রিত-নির্জীব, জাগালেন তাকে চিরসাথী দয়ালু অন্তর্যামী।

৩. নফসে মুলহিমাহ [প্রেরণাপ্রাপ্ত নিজ] ঃ মানুষ এই অবস্থায় (অর্থাৎ এই নফসের মাধ্যমে) তার প্রভুর পক্ষ থেকে সরাসরি পথ-প্রদর্শনের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়।

হে চিরন্তন! আমি আর কতকাল সত্যের সন্ধানে ডিগবাজী খাবো?
পথ-প্রদর্শনের ক্ষেত্র [নফসে মুলহিমাহ] কোথায় খুঁজে পাবো?
তুমি দয়া করো প্রভু! বানাও একে পথ-প্রদর্শনের দিশারী-
যাতে ভেসে ওঠে অন্তর্দৃষ্টে নূরে'আলা সীরাতুল মুস্তাকীম- দেবো যেপথে পাড়ি।

৪. নফসে মুতমায়িন্নাহ [সন্তুষ্ট নিজ] ঃ মানুষ যখন এই স্তরে উপনিত হয় তখন সে প্রভুর ইচ্ছায় প্রশান্তি লাভ করে। সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

কোথায় ছিলে লুকিয়ে হে চিরপ্রশান্ত ‘আপন’ [নফসে মুতমায়িন্নাহ]!
‘তুমি আপনকে’ ঘিরে রেখেছিলো আরো কতো আপন।
তবে আমি এখনো হই নি শান্ত!
আমি থাকতে চাই না আর, আপনসমূহের মাঝে জ্যান্ত।

৫. নফসে রাদ্বিয়্যাহ [সদারাজী নিজ] ঃ এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের মনযিল। এ অবস্থায় মানুষ দুঃখ-বেদনাকে সহজে মেনে নিতে পারে। ভালো ও মন্দ দু’টিই তার কাছে সমান- অর্থাৎ সে জানতে সক্ষম হয় এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সে সর্বদাই তার প্রভুর প্রতি আনন্দিত কারণ, সে আল্লাহর আশিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নরকের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ও স্বর্গের মহাসুখ
বুঝিনা কিছু আর, হে আমার মাশুক!
আমাকে আমি হারিয়েছি তোমার মাঝে চিরতরে
কি-ই বা চেতনা আসবে, প্রেমাগ্নিতে ভস্ম এ মনে?

৬. নফসে মারদ্বিয়্যাহ [রাজীপ্রদত্ত নিজ] ঃ এ অবস্থায় সালিক পবিত্র হয়ে যায়। সে আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হয়। সে তার নিজস্ব অস্তিত্ব থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। তার চেতনায় থাকেন শুধু একমাত্র মা’বুদ- আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা।

আমার জীবন-মরণ তোমার মাঝে বিলুপ্ত
শুধু তুমি [হু], শুধু তুমি [হু], তুমি চিরসত্য।
জড়-অজড়ে প্রতি অণু-কণায় তোমার নূর উদ্ভাসিত,
অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সবই শুধু শুধু তব গুণে গুণান্বিত।

৭. নফসে সাফিয়্যাহ [পবিত্র নিজ] ঃ এটাই সর্বোচ্চ মানবিক অবস্থা। এ স্তরে উপনিত হলে মানুষ ইনসানে কামিলের (সর্বোত্তম মানবের) কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সে আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়।

আমি নেই! আমি নেই! আমি চেতনাহীন, সর্বহারা!
নির্জীব, মরদেহ থেকে আসে কি কখনো কোনো ইশারা?
আত্মা তার বাসস্থানে ফিরে গেছে চিরতরে,
সে চিরশান্ত, চিরসন্তরণে রত মহাপ্রভুর প্রেমসায়রে।

উপর্যুক্ত প্রতিটি মনযিল, মাক্বাম বা স্টেশন প্রত্যেক সত্যান্বেষী তরীকতপন্থীকে অবশ্যই পাড়ি দিতে হবে। এসব স্টেশন দীর্ঘ রেল ভ্রমণের মেইন স্টেশনসমূহের মতো। মনে করুন আপনি রেলপথে সিলেট থেকে ঢাকা যাত্রা করলেন। আপনি লকেল কিংবা আন্তঃনগর ট্রেনে যান- তাতে কিছু আসে যায় না- আপনার ট্রেনটি অবশ্যই মেইন ক'টি স্টেশনে থামবে। যেমন কুলাউড়া, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, ভৈরব, টঙ্গি ইত্যাদি। আপনি যদি লকেল ট্রেনের যাত্রী হয়ে থাকেন তাহলে, এসব প্রধান স্টেশন ছাড়াও ছোট ছোট অনেকগুলো স্টেশনে ট্রেনখানা থামবে। আর আন্তঃনগর (স্পেশাল) ট্রেনে যাত্রা করলে শুধুমাত্র উপরোক্ত মেইন স্টেশনগুলোতে থামবে। তবে আসল কথা হলো, উভয় যাত্রাতেই প্রধান স্টেশনগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ইলমে মা'রিফাতের ভ্রমণও ঠিক তদ্রূপ। এবার এসব স্টেশন বা স্তরের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে লিখার প্রয়াস পাচ্ছি।

সাত স্তরের বর্ণনা

প্রথম মনযিল ঃ নফসে আম্মারা

ইতোমধ্যে আমরা নফসে আম্মারার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছি। এটা মানবের মধ্যে জীবাত্মার বিকাশ বলা চলে। এর একমাত্র কাজ হলো আমাদেরকে প্রভু সম্পর্কে গাফিল রাখা। তাঁর থেকে দূরে সরানো। অথচ একই সময় নফসে আম্মারার জনক জীবাত্মা, বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি করে যাচ্ছে। যেমনঃ- দেহের নড়াচড়া, খাওয়া-পরা, ঘুমানো, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ইত্যাদি।

নফসে আম্মারার এক শক্তিশালী সহযোগী বন্ধু আছে। তার এই সখার নাম শয়তান। সুতরাং একে নিয়ন্ত্রণ রাখা সবার জন্য অবশ্যকরণীয়। কারণ শয়তানকে পরাজিত করতে যেয়ে তার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে যদি দুর্বল করে দিতে আমরা সক্ষম হই, তাহলে তাকেও অনেকটা দুর্বল করা হবে। এদেশে ইংরেজরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটা কৌশল এঁটেছিল। তা ছিলো, 'ডিভাইড এন্ড রোল'- অর্থাৎ ভাগ করে শাসন করো। তাদের এই পলিসি এতোই সফল হয়েছিল যে, আজো এই পলিসি কুফরী সকল শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। যা হোক নফসে আম্মারা ও শয়তাদের মধ্যকার জোটকে ভেঙ্গে দেওয়ার কিছু বিশেষ পদ্ধতি আছে।

বেশী খাওয়া, বেশী পরা, যশ-খ্যাতি-ধনের আকাঙ্ক্ষা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বহু ধরনের খারাপ কাজের দিকে মানুষকে এই নফসে আম্মারাই ধাবিত করে থাকে। সুতরাং যখন এই নফস বলবে, বেশী খেলে আরাম পাবে তখন তাকে ধমক দিয়ে পাল্টা বলতে হবে, তোর এই কথাটি সঠিক নয়! বেশী খেলে মানুষ অলস হয়, শরীরে মাত্রাতিরিক্ত মেদ তৈরি হয়, ইবাদতে মন বসে না ইত্যাদি। সে যখন লোভ দেখাবে- অমুক অমুক ব্যক্তি বিরাট ধন-সম্পদের মালিক হওয়ায় এই করছে- সেই করছে। তুমি কেনো মালের মালিক হওয়ার চেষ্টা করছো না? জবাব

দিতে হবে- এটা তোর ছলনা মাত্র! ধন যতটুকু দরকার ততটুকুই যথেষ্ট। বেশী ধন মানুষকে গাফিল করে ফেলে। তার মধ্যে প্রবল করে দেয় গরিমা ইত্যাদি।

এই স্তরে মানুষের মধ্যে ন্যায়নীতি ও যুক্তিতর্ক খুব একটা সবল থাকে না। এর ফলে মানুষ তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সময় সময় বেআইনী ও গোণাহের কোনো পথে পা বাড়াতেও দ্বিধাবোধ করে না। সে পুরোদমে তার রাগ, আত্মস্বার্থ, এঁকগুয়েমী, জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যশ-খ্যাতির লালসা, অলসতা, বোকামী ইত্যাদি সব ধরনের খারাপ কার্যাবলীর বিকাশ ঘটায়। এসব থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সারা জীবন চেষ্টা-চালিয়ে যেতে হবে। কোন উপায়েই নফসে আম্মারার এসব কু-কর্মের প্রতি আনুগত্যতার মধ্যে ডুবে গেলে চলবে না। তবে এই বিরাট যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে আমাদের চেষ্টার মাত্রার উপর। কিন্তু অপর কারোর ওয়াসিলা ও সাহায্য ছাড়া এই 'জিহাদে আকবর'-এ বিজয়ী হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

আপনি যদি কোনো কামিল পীরের মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন তাহলে নফসে আম্মারার এসব অনৈতিক, গ্বাইরুল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট ছলনা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার মুর্শিদের প্রতিটি উপদেশ, যিকির-আযকারের সবক ইত্যাদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। শুধু মুরীদ নয়- মুরীদের মতো মুরীদ হতে হবে।

নফসে আম্মারাকে অনেকে শয়তানের বন্ধু নয়, স্বয়ং তার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। শয়তান থেকে সে কোনো ক্রমেই কম দুশমন নয়। বাস্তবে নফসে আম্মারা হচ্ছে আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটের দুশমন। সে সর্বদা আমাদের সঙ্গী। তার কারণেই মানবাত্মা আমাদের চেতনার গভীরে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। সেখানে পৌঁছার কেনো সুযোগই দিচ্ছে না শয়তান-রূপী এই নফসে আম্মারা।

যেই মুহূর্তে কেউ কোনো কামিল পীরের নিকট বাইআতের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখনই এই নফসে আম্মারা কানকথা শুরু করে দেয়: "এ পথে পাড়ি দেওয়ার মধ্যে তোমার কী ফায়দা থাকতে পারে? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যারা এপথে গিয়েছে তাদের সবাইকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে! তাদের

যাকিছু এই পৃথিবীতে রয়ে গেছে তা তাদের দু-চারটে কথা মাত্র। আমি জানি তুমি সত্যকে আবিষ্কার করতে চাও। কিন্তু যারা তা তোমাকে শিক্ষা দেবে তারা কোথায়? তাদের যুগ তো অতীতে চলে গেছে। আমাকে একজন সত্যিকার ওলিআল্লাহ দেখাও! যিনি কাশফ ও কারামতের অধিকারী! সে যুগ আর নেই। আজকের যুগ হচ্ছে তথ্যের যুগ, বাস্তবতা, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং উন্নত জীবনের যুগ। তুমি যদি ধার্মিক হতে চাও তাহলে আপত্তি কিসের? ঠিক আছে! মসজিদে যাও, উপাসনা করো, রমজানে রোযা রাখো এবং অতীতের এসব ওলিআল্লাহদের ওয়াসিলায় আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন এই প্রার্থনা করো। তোমাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আজকের যুগে কোনো শিক্ষক আর নেই!"

এভাবেই শয়তান সত্যকে গোপন রাখে। সে আরও বলে, আল্লাহকে তুমি সরাসরি ডাকবে- অপরের সাহায্যের প্রয়োজন কী? পীর ধরার কিসের দরকার? মনে রাখতে হবে কুফর শব্দের অর্থ ঢাকা, ঢেকে রাখা। কাফির অর্থ অবিশ্বাসী- অর্থাৎ যে ঢেকে রাখে। নফসে আম্মারা তথা আমাদের মধ্যে বসবাসকারী শয়তান সেই সত্যকে ঢেকে রাখে যে, সর্বকালেই আল্লাহর ওলিআল্লাহরা জীবিত আছেন। এরাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। সুতরাং সঠিক পথ পেতে হলে শুধু উপাসনা যথেষ্ট নয়। ঐ পথে যে ভ্রমণ করেছেন তার নিকট যেতে হবে। তিনিই দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে পারেন ঐ পথের সন্ধান।

সায়্যিদিল মুরসালীন, আমাদের সর্দার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুটি দিক ছিলো: (১) তাঁর নুবুওয়াত (ওহি-প্রাপ্তি) ও (২) ওলিআল্লাহ হওয়া। তিনি খাতামুল আম্বিয়া- সর্বশেষ নবী, নুবুওয়াতের সীল-মোহর। কিন্তু তাঁর অপর দিক অর্থাৎ ওলিআল্লাহ হওয়া তাঁর পরবর্তীদের মধ্যেও জারী থাকবে এবং আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ কথাটি সত্য। অর্থাৎ তিনি পর্যন্ত তরীকতের সিলসিলা জারী থাকবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত। এই সিলসিলাকে পীর-দরবেশরা শাজারাহ [শাখা-প্রশাখাসর্বস্ব বৃক্ষ] বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান যামানায় এসে এ শাজারাহ ৪০ থেকে ৪৫ সংখ্যায় এসে পৌঁছেছে। সুতরাং যে কেহ হক্কানী কোন পীরের মুরীদ হবেন, তিনি এই বৃক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন- আর ইলমে মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বামে আল্লাহর অনুগ্রহে আরোহণ করতে সমর্থ হলে শাজারাহর মধ্যে পরবর্তী নাম হবে তাঁরই- অর্থাৎ তিনিও তরীকতের খলিফা হওয়ার গৌরব অর্জন

করবেন। তবে এই গৌরব অর্জন কঠিন কাজ। কারণ শয়তান কখনও তার প্রচেষ্টাকে শিথিল করবে না। এ রাস্তায় নামলেই তার তৎপরতা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সালিকের কানে সে ওয়াসওয়াসার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

সালিক যদি শয়তানের ওসব কানকথার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বসে, তাহলে সর্বনাশ! সে তখন তরীকাত ও মারিফাতের উপর সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। পীর-মুরীদীর প্রয়োজন তার কাছে আর গ্রহণযোগ্য হয় না। সে বুঝতে পারে না যে, কোনো পথে অগ্রসর হতে হলে একজন গাইড বা পথপ্রদর্শক আবশ্যক। কারণ, শয়তান তাকে পরামর্শ দিয়েছে, আজকের যুগে সঠিক গাইড অবশিষ্ট নেই! এই অবস্থায় পতিত সালিকের কানে এবার সে আরও ফিসফিস করে: "দেখো! আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল। তাঁর ক্ষমার উপর ভরসা করতে থাকো! তিনি যাকিছু অনুমতি দিয়েছেন তা যদি কেউ করে তাহলে তিনি অপছন্দ করেন না। নিজের প্রতি জুলুম করো না- তার প্রতি দয়াবান হও। তুমি যদি তোমার নিজের প্রতি দয়াবান হও ও সে যা চায় তা প্রদান করো, তাহলে সে অবশ্যই তোমাকে মেনে চলবে!" সালিক যদি এহেন লালসাপূর্ণ বাক্য দ্বারা বোকা বনে যায় তাহলে সে সন্দেহের গভীরে নিমজ্জিত হবে। কোন্ জিনিস বে-আইনী কোন্টা নয়- অর্থাৎ হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যাবে। এ স্তরে পতিত সালিক সাধারণত হারামের প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)। একই সময় তার হৃদয় শক্ত ও অন্ধ হয়ে যায় এবং সে খারাপের দিকে আরও বেশী আকর্ষিত হতে থাকে।

এহেন দুঃখজনক অবস্থায় পতিত বান্দাহর পক্ষে নিজের চেষ্টায় সঠিক পথে ফিরে আসা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যবশত যদি আল্লাহর অনুগ্রহে সে কোনো কামিল পীরের সুহবতে এসে যায় এবং খালিস নিয়তে তওবা করে আত্মশুদ্ধির রাস্তায় নামে, তাহলে তার জন্য এই দুরাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া অনেকটা সহজ হবে। তাকে অবশ্যই নফসে আম্মারার কানকথার বিরোধিতা করতে হবে। সর্বদা এই শয়তানের কৌশল বুঝার চেষ্টা চালাতে হবে। এর যৌক্তিক ও মনোমুগ্ধকর কথার ফাঁকে কোথায় কু-মতলব লুকিয়ে আছে তা ভালোভাবে দেখতে হবে, জানতে হবে ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এককথায়, নফসে আম্মারা যে কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছে কি না খেয়াল রাখতে হবে। জীবনচলার পথে মানুষের যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কোনো কিছুর প্রতি লোভ-লালসা জন্ম নিলেই বুঝতে হবে নফসে আম্মারা ক্রিয়াশীল আছে। আমরা অনেকে বুঝতেই পারি না কোন্ সময় কিভাবে, কোন্ কৌশলে এই নফসে আম্মারা আমাদেরকে বেপথে নিয়ে যাচ্ছে! সুতরাং এ থেকে সাবধান!

আমরা ভাগ্যবান হলে ও নিজেদেরকে যদি নফসে আম্মারার কলা-কৌশল থেকে মুক্ত করতে পারি তাহলে হয়তো আল্লাহ চাহেন তো, পরবর্তী স্তরে উপনিত হতে সক্ষম হবো। আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।

নফসে আম্মারা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

-"নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ।" [সূরা ইউসূফ : ৫৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন:

أى لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين

-[হে আল্লাহ!] চোখের একটি পলকের জন্যও আমাকে নফসের নিকট সোপর্দ করবেন না।" [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ]

নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ

হ্যাঁ, এটা জিহাদ বটে- কিন্তু তা নয় তরবারি, গুলা-বারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র বাহুতে ধারণ করে কাফিরদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার যুদ্ধ। এ সমর 'নিজের মন্দ স্বভাবের' বিরুদ্ধে। মহাত্মন ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে প্রেরণা পেতে পারি এ জিহাদের নমুনা অনুধাবনে। দেখুন, কী সুন্দর তিনি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন তাঁর স্বরচিত 'বুস্তানুল আ'রিফীন' গ্রন্থে।

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "রিয়া কী জিনিষ, তা শুধু মুখলিছ ব্যক্তি জানে।" এর মা'না হলো, মুখলিছ হওয়ার রাস্তায় পাড়ি না জমালে কখনো খোদাপ্রাপ্তির পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা 'রিয়া' নামক কুপ্রবৃত্তি কি জিনিষ তা বুঝাই যাবে না- এটা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা তো পরের কথা। সুতরাং কেউ যতো বড় জ্ঞানবান হোন না কেন, নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নেমে যদি দাবী করেন, রিয়া কী জিনিস তার জানা হয়ে গেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই ভ্রমের মধ্যে নিপতিত আছেন।

দেখুন, নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদের নমুনা কী সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে সুফিকূল শিরোমণি ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক পূর্ণ সনদসহ উদ্ধৃত হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি কথায়।

ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসাওউফের প্রামাণ্যগ্রন্থ 'রিসালাতুল কুশাইরী' কিতাবে বলেন: "আমি মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন: আমি আহমদ ইবনে আলী ইবনে জাফরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি হুসাইন ইবনে আলউইয়া থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন: আমি আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: 'আমি দীর্ঘ বারো বৎসর নিজের নফসের কামার [হাদ্দাদু নাফসী] ছিলাম। এর পরবর্তী পাঁচ

বৎসর অমি ছিলাম নিজের হৃদয়ের আরশী হিসাবে [মিরআ'তু ক্বালবী]। পরের এক বৎসর যাবৎ এ উভয়ের [অবস্থার] মাঝখানে কি আছে দেখেছি। দেখলাম [তখনো] বাঁধা আছে আমার কোমরে একটি কোমরবন্দ [সে যুগে কাফির জিম্মিদের পরিচয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কোমরে বাঁধাকৃত বেল্ট]। সুতরাং এটি কেটে দিতে আরো বারো বৎসর সাধনায় রত হলাম। পুরনায় দৃষ্টিপাত করে দেখি এখন আমার চতুর্দিকে বিদ্যমান আরেকটি অদৃশ্য কোমরবন্দ! তাই অব্যাহত রাইলো কঠোর সাধনা। এটাও কেটে দিতে সংগ্রাম করলাম আরোও পাঁচটি সাল। অবশেষে আমার নিকট [সবকিছুর অভ্যন্তরীণ হাক্বিক্বাত] উন্মোচন করা হলো [কাশিফা লী], এবং আমি সৃষ্টির প্রতি তাকালামঃ দেখি, সবকিছু মৃত! সুতরাং তাদের জন্য জানাযার নামায পড়লাম।”

মহাত্মন বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোদ্ধৃত উক্তির ব্যাখ্যায় বলা যায়ঃ জীবী-নির্জীব, জড়-অজড়, আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু মূলত সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন [ঠিক মৃতদেহের মতো]। এগুলোর বাহ্যিক ‘ক্ষমতা’, ‘নড়াচড়া’, ‘ক্রিয়া-কলাপ’ ইত্যাদি মূলত আল্লাহর নির্দেশের প্রতিফলন। তাহলে একমাত্র চিরন্তন জ্যান্ত হলেন ‘আল-হাইয়্যুল ক্বাইউম’ মহান রাব্বুল আলামীন। এ কথাগুলো আমি চিন্তা-গবেষণা করে ‘ভাষায়’ প্রকাশ করেছি। আর হযরত বায়িজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অনুধাবন করে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ও আমি অধমের মধ্যে তাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সৃষ্ট বস্তুর ক্ষমতাহীনতা ব্যক্ত করতে কবি বলেনঃ

তারা না পারে ক্ষতিসাধন না পারে লাভবান করতে;
তারা না পারে দিতে কিছু না ধরে রাখতে;
তারা না পারে জীবনদান না পারে মৃত্যু দিতে;
তারা না পারে টানতে না পারে কেটে দিতে;
তারা না পারে কাছে আনতে না পারে দূরে ঠেলে দিতে;
তারা না পারে খুশী করতে না পারে বেদনা দিতে;
তারা না পারে আরোপিত না পারে বঞ্চিত করতে;
তাদের কাছে না আছে সুফল না আছে বিফল,
না দিতে জানে মৃত্যু, না জীবন, না পুনরুত্থান।

দেখুন, ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ইহইয়া উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে 'নফসে আম্মারা' সম্পর্কে কী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

নফসের [মন্দ স্বভাবের] দু'টি অর্থ আছে: ১. গোশ্বা শক্তি ও যৌনাকর্ষণ। সুফিরা এ দু'টো নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাধনা করেন। তাই তারা বলেন:

لَا بُدَّ مِنْ مُجَاهَدَةَ النَّفْسِ وَكَسْرِهَا

-"অবশ্যই নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একে ভেঙ্গে দিতে হবে।"

২. নফসের দ্বিতীয় অর্থ হলো 'রূহ' বা আত্মা। তবে এর বিভিন্ন মনযিল বা স্তর আছে। স্তর মুতাবিক এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এসব স্তরের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি। এসব স্তরই হলো 'মানাযিলে মা'রিফাত'।

"তোমার নফ্সকে থেমে দিতে কাউকে সুযোগ দেবে না। যেখানেই তোমার একাংশ যাবে অবশেষে সেখানে বাকী অংশও পৌঁছুবে।"

- রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা

দ্বিতীয় মনযিল ঃ নফসে লাওয়ামাহ

আগেই বলে রাখি- এ লেখাটুকু তরীকতপন্থী সালিকদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর মা'রিফাতের এসব স্তর সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নয় তাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা। সুতরাং এসব স্তর হচ্ছে পীর-মুরীদীর ব্যাপার। কেউ যদি এ পথে না থেকেও এই লেখা পাঠ করেন তাহলে তার নিকট কিছু কিছু কথা অদ্ভুত ও কঠিন বলে বোধ হতে পারে। আমি আশা করবো সবাই আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ লেখাটুকু পাঠ করবেন।

এই স্তর হচ্ছে ফেরেশতাসুলভ প্রকৃতিতে উন্নয়নের পথে সালিকের দ্বিতীয় স্টেশন। এখানে উপনিত হয়ে সে নিজের যাবতীয় আমল বা কার্যাবলীর উপর ওয়াকিফহাল থাকে। সে জানে কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি সঠিক নয়। তবে যা তার জন্য ক্ষতিকর তা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে সক্ষম হয় না কিন্তু, কাজটি সম্পাদন করার পরমুহূর্তে আক্ষেপ করতে থাকে। ভালো-মন্দ সম্পর্কে পুরো ওয়াকিফহাল থাকার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এখনও নফসে আম্মারার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পেরে পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তথাপি এ স্টেশন অবশ্যই আগেরটার তুলনায় শ্রেয়। কারণ, সালিক অন্তত নিজেকে ধর্মকর্মের দিকে ধাবিত রাখার চেষ্টায় রত হয়েছে। সে তার নিজের অপকর্মের ব্যাপারে সচেতন থাকায় নিজেকে ধিক্কার দিতে শিখেছে।

ধর্মকর্ম ও ভালো কাজের দ্বারা সালিক এ স্তরে পৌঁছে নিজেকে জাহির করতে অভ্যস্ত থাকে। সে চায় লোকে তাকে ভালো বলুক, তার ভালো পাবলিসিটি হোক। সে অপরের পক্ষ থেকে নিজের উত্তম কাজের প্রতিদান স্বরূপ বাহবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। এতে সে অনেকটা রিয়া বা দর্শনেচ্ছুর মধ্যে পতিত হয়। যদিও সে তার এ দুরাবস্থার ব্যাপারটি সময় সময় বুঝতে সক্ষম হয় এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। সে চায় এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। রিয়া হচ্ছে খুব বড় ধরনের গোনাহ। আর রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হলো লোক-দেখানো কাজ। যে কোন কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, এ থেকে একটু হেরফের হলেই

বুঝতে হবে, রিয়ার গন্ধ একেবারে মুছে যায় নি। বাস্তবে এই দ্বিতীয় স্তরটি প্রত্যেক সালিকের জন্য সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। কারণ, এখানে এসেই অধিকাংশ খোদান্বেষী আটকা পড়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

এই স্তরে রিয়া ছাড়াও আরো দুটি ভীষণ ক্ষতিকর জিনিস আছে। এর একটি হলো গরিমা আর অপরটি রাগ। পূর্ববর্তী স্তর থেকে এই দ্বিতীয়টিতে উপনিত হয়ে আমরা ভালো কাজের দিকে নিজেদেরকে সচেষ্ট রাখি বটে। কিন্তু একই সময় মনে মনে বেশ গৌরববোধও করি। এসময় অপরের কাছ থেকে নিজের ব্যাপারে সুনামের আকাঙ্ক্ষায় এতো বেশী মত্ত হই যে, যদি তা কোন বিশেষ ব্যক্তি তা করতে অপারগতা দেখায় তাহলে তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হই। অথচ এ স্তরের বড় বড় দুশমন বা শয়তানের মন্ত্রী-মিনিস্টাররা হলো রিয়া, গরিমা, নিজের প্রতি মিথ্যারোপ, রাগ, অপরের প্রতি অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। নফসে লাওয়ামাহর এই স্তরে পৌঁছে আমরা মোটেই শয়তানের কারসাজি থেকে নিরাপদ নই। সে তখনও আমাদের শিরা-উপশিরায় গরিমার চরিত্রকে ঢুকিয়ে দিতে মত্ত থাকে এবং ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলে: “এখনতো তুমি তোমার মুর্শিদের চেয়ে কম নও! বাস্তবে তুমি তার থেকেও উপরের স্তরে পৌঁছে গেছো! তাঁর উপদেশের আর কি দরকার? এবার তোমার বুযুর্গি জাহির করার সময়। তুমি যে কতো উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছো তা লোকে জেনে তোমাকে ওলিআল্লাহ বলবে। এর চেয়ে গৌরবের আর কি আছে?”

শুধু শয়তান নয়, এই স্তরে পৌঁছার পর সালিকের সামনে সমগ্র বিশ্ব এসে দাঁড়িয়ে যায়, কিভাবে তাকে বেপথে নিয়ে যাওয়া যায়। এই স্তরটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার স্তর। এখানে এসে যদি আটকা পড়ে যায় তাহলে সে ব্যর্থ হলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলে সে এ স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে উপনিত হবেই। তবে তাকে অবশ্যই তার কামিল মুর্শিদের প্রতিটি নির্দেশ ও উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেতে হবে।

এই স্তরে যে তিনটি বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে নিষ্কৃতির কয়েকটি উপায় আছে। প্রথমতঃ রিয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে ভাবতে হবে যে, এই জগতটি অস্থায়ী। অন্যদের মন্তব্যও স্থায়ী নয়। সুতরাং অস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়ী

মন্তব্য থেকে কী ফায়দা হতে পারে? চিরন্তন জগতের পাথেয় সংগ্রহই তো আসল জিনিস। রিয়ার (অর্থাৎ ইখলাস ছাড়া লোক-দেখানো ইবাদত ও ভালো কাজের) মাধ্যমে অর্জিত সবকিছুই এই দুনিয়াতে পড়ে থাকবে আর সাথে যাবে ভালো কাজ করার পরও গোনাহ আর গোনাহ। এই পৃথিবী ও পরকাল যথাক্রমে একটি সাধারণ মোমবাতি ও সূর্যের মতো। সূর্যের আলোর সামনে মোমবাতির আলোর মূল্য কী থাকতে পারে? আর সূর্যালোকের মধ্যে কোন্ বোকা মোমবাতি জ্বালাবে? না কখনও, অপরের বাহবা, সম্মান দান ও সুনাম প্রদানের উপর নির্ভরশীল হতে নেই। এদিকে তাকানোই ঠিক নয়। কারণ এটা জানা কথা যে, "যে কেউ সুনাম অর্জনে মত্ত সে অবশ্যই তোমার দুশমন কারণ, সে তোমার দুশমনের বন্ধুজন। আর যে কেউ তোমার দোষত্রুটিগুলো তোমাকে দেখিয়ে দেয় সে তোমার দুশমনের দুশমন। আর তোমার দুশমনের দুশমন তোমার মিত্র।"

এই স্তরে দ্বিতীয় ক্ষতিকর জিনিস হচ্ছে গৌরব। এ থেকে বাঁচতে হলে এটা ভাবা উচিত যে, বাস্তবে মানুষ তো আসলে কিছুই ছিলো না। একবিন্দু বীর্য থেকে সে অস্তিত্বলাভ করেছে। তার আবার গৌরবের কি থাকতে পারে? সে যা কিছুই করুক না কেনো, এ সবই তাঁর পালনকর্তার অনুগ্রহ মাত্র। এখন সে ভাবছে একটা কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সে মাটির নীচে চলে যাবে। এই সোনার দেহ তখন কীট-পতঙ্গের খাদ্যে পরিণত হবে। সুতরাং যে জিনিস কিছু ছিলো না এবং অবশেষে কিছু থাকবেও না, তা নিয়ে কিসের গৌরব আর গরিমা? সৌন্দর্য, শক্তি, যশ, খ্যাতি, বুদ্ধি, কর্ম সবই বিলুপ্ত হবে। আর যা বিলুপ্তশীল, ক্ষয়শীল, অস্থায়ী তার আবার মূল্য কিসের? মূল্যবান শুধু সেই জিনিস, যার ক্ষয়-লয় নেই, যা চিরস্থায়ী। সুতরাং মানুষকে নিজের কর্ম ও অস্তিত্ব নিয়ে গৌরব করা বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। শুধুমাত্র এ জিনিসটি অনুধাবন করে নেওয়াই যথেষ্ট যে, মানুষ স্বয়ং নিজের (তার জীবন ও দেহের) মালিক সে নয়। বাস্তবে আমাদেরকে এ জীবন দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আরেকটি আমানত হিসেবে। আমার কাজ হলো একে হিফাজত করা। যা কিছু ভালো কাজ আমি করবো এগুলো স্রষ্টারই কাজ। আর যখন আমি মন্দ কাজে লিপ্ত হবো, তখন আমি আমার স্রষ্টার বিরোধিতায় পতিত হয়ে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে দিচ্ছি। নিজের প্রতিই জুলুম করছি। সুতরাং সর্বাবস্থায় আমাদেরকে ভালো কাজ

আঞ্জামের তাওফীক দেওয়ায় আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার হতে হবে এবং যাবতীয় মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

রাগ একটি ভীষণ ক্ষতিকর বস্তু। এই দ্বিতীয় স্তরে তিন নাম্বার বড়ো দুশমন হচ্ছে এই রাগ। সাধারণত রাগের বন্ধু হিসেবে গরিমা জিনিসটি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং গরিমাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলে রাগও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

মানব চরিত্রে এই গরিমা নামক জিনিসটির প্রাবল্যের ফলে সে দুঃখ-দৈন্য কিংবা দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত হলে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে। কোন কোন সময় সে ভাবে, আমার কর্মের ফল স্বরূপ যেসব প্রতিদান পাওয়া উচিত তা আমি পাই নি। এর ফলে সে ভেতরে রাগ-গোস্বা অনুভব করে। এই রাগ সময় সময় অন্যায়ভাবে অপরের প্রতি পতিত হয় ও কর্মে তা প্রকাশ পায়। এই অন্যায় কাজের ফলে মানুষ এ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কথিত আছে, রাগ হচ্ছে হারাম জিনিস। এর কারণ হলো, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এতে রাগের নেতিবাচক দিকটি প্রবল হয়ে ক্ষতিকর অবস্থানে পতিত করে। এছাড়া খুব দ্রুত রাগ নামক মানবিক ইমোশন মানুষের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে এসে রাগান্বিত ব্যক্তি তার বিবেককে পর্যন্ত পরাজিত করে বসে। তখন অবস্থার মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। রাগের কারণেই মানুষ মানুষকে খুন করে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে, একে অন্যের বিরাট ক্ষতি করে। সুতরাং এই রাগ জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রত্যেকের জন্যই একান্ত জরুরী। আর মা'রিফাতের সালিকের জন্য তো ফরযে আইন।

রাগ যখন আমাদের মাঝে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে তখন একে নিভানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আগুন যেভাবে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ঠিক তদ্রূপ জ্বলন্ত রাগ জ্বালিয়ে দেয় আমাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী বলতে যাকিছু আছে; সমবেদনা, করুণা, প্রেম-প্রীতি, ভদ্রতা, উদারতা, সংলাপ ও সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা, লাভ-ক্ষতির চিন্তা-ক্ষমতা এবং বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। বাকী থাকে শুধু অতি-রাগে অন্ধ এক ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু!

রাগ নিবারণের কয়েকটি পথ আছে। তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী থেকে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার পাবো। তিনি বলেন: যখন রাগ পাবে তুমি সাথে সাথে যে অবস্থায় আছো (দাঁড়ানো, বসা ইত্যাদি) তা থেকে নিজেকে পরিবর্তন করো। যদি তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে থাক তাহলে বসে পড়। আর বসা অবস্থায় থাকলে শোয়ে যাও। এরপরও তোমার রাগ লোপ না পেলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু করে নাও। এছাড়া তিনি বলেছেন, আল্লাহর দরবারে এ থেকে পানাহ চাও এভাবে, "ইয়া আল্লাহ! আমাকে জ্ঞান দ্বারা উন্নত করো। দয়া দ্বারা আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করো। আমাকে সঠিক ধার্মিকতার সম্পদে ভূষিত করো এবং দান করো তোমার প্রতি ভয় ও আশার আলো, এসাথে অনুগ্রহ করে আমাকে সুস্বাস্থ্য দিয়ে ধন্য করো। আ-মিন।"

সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের উপরে উল্লেখিত যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু ও বিপদ-আপদ থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকতে সক্ষম হই তাহলে হয়তো আল্লাহর অনুগ্রহে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবো। কারণ তৃতীয় স্তর যাকে তাছাওউফের ভাষায় 'নফসে মুলহিমাহ' বলে, তা হচ্ছে এমন একটি স্তর যেথায় তরীকতের সালিক প্রভুর পক্ষ থেকে আরও অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

নফসে লাওয়ামা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

-"আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।" [ক্বিয়ামাহ : ২]

"সত্যিই এ মহাবিশ্ব কল্পনা মাত্র। শুধু তিনিই বাস্তব সত্য। যে কেউ এটা বুঝে ফেলেছে, সে তো আধ্যাত্মিক রাস্তার গোপন কথা জেনে নিয়েছে!"

- শায়খুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তৃতীয় মনযিল ঃ নফসে মুলহিমাহ

এই স্তরে উন্নীত হয়ে সালিক তার উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান পায়। আর এই উত্তম কাজগুলো হলো সাধনা, বিপদে ধৈর্য ধারণসহ সামনে অগ্রসরের আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি স্বীয় মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য। এখানে এসে পৌঁছার ফলে তার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রকাশ হওয়া শুরু হয়। সে ভেতরে ভেতরে এসব শব্দহীন প্রেরণা অনুভব করতে থাকে। এগুলো তাকে আরও সামনে এগিয়ে যেতে পথনির্দেশসহ উৎসাহিত করে তুলে। কিন্তু এরপরও ভীষণ ক্ষতিকর কিছু বিপদ-আপদ থেকে যায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হচ্ছে এই: মরদুদ শয়তানও নকল ঐশী প্রেরণা যোগানোর ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা ঐশী ইশারা বা ইলহামী জ্ঞান বলে মনে হয়- তা-ও কিন্তু বাস্তবে শয়তানের কারসাজি হতে পারে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান (স্বপ্নের মাঝে) সবার রূপ ধারণ করতে পারে একমাত্র আমার ছাড়া।

সুতরাং, তৃতীয় এই স্তরে উন্নীত সালিককে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ সে জানে, সালিক যদি আরও অগ্রসর হয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে কিছু করার আর ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না। প্রত্যেক সালিককে তাই এই স্তরে উন্নীত হওয়ার পর শতগুণ বেশী সতর্ক থাকতে হবে। আর এ কারণে সালিককে স্বীয় মুর্শিদের সান্নিধ্য আরও বেশী বেশী করে অর্জন করা জরুরী। সম্ভব হলে অধিক সময় তাঁর সুহবতে কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কারণ, কোন ইলহাম, কাশফ বা ঐশী জ্ঞান সত্যিই বিশুদ্ধ কি না তা ধরতে সক্ষম হবেন একমাত্র কামিল মুর্শিদ - অন্য কেউ নন। তিনিই আসল ও নকলকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। সুতরাং স্বপ্নে হোক আর এমনিতেই হোক প্রেরণামূলক যতো ধরনের জ্ঞান মুরীদের অন্তরে জাগ্রত বা নিক্ষিপ্ত হবে তা সাথে সাথে স্বীয় মুর্শিদের নিকট ব্যক্ত করতে হবে। মুর্শিদ এর হাক্বিকাত বুঝাবেন এবং সঠিক রাস্তায় চলতে মুরীদকে গাইড করবেন।

মুর্শিদ-মুরীদ সম্পর্ক এই স্তরে এসে খুব গাঢ় হয়ে থাকে। কোন অবস্থাতেই সালিককে তার মুর্শিদের কাছে কোন কিছু লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়। তার আশা-ভরসা, ভয়-ভীতি, ভুল-ত্রুটি, সুস্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন সবকিছু মুর্শিদের কাছে খুলে বলতে হবে। এমনকি কোন বিষয়ে মুর্শিদের চিন্তা-ভাবনা ও আমল-ঈমানের ক্ষেত্রে নিজেরটার সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হলে- বা যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য অনুভব হলেও তা ব্যক্ত করতে হবে। এককথায়- সালিক কোন কিছু গোপন রাখতে পারবে না। ঠিক যেভাবে একজন রোগী তার গোপনীয় কথাগুলোও সঠিক চিকিৎসা পেতে ডাক্তারের কাছে অকপটে বলতে বাধ্য হয়- ব্যাপারটা তদ্রূপ। মুর্শিদকে এভাবে আপনজন মনে করে যাবতীয় কথা ব্যক্ত করার পর তিনি সঠিক পথ-নির্দেশনা দেবেন। সালিক যদি তাঁর প্রতিটি উপদেশ কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়, তাহলে আশা করা যায় তার উন্নতি সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে। সে পরবর্তী স্তরে পৌঁছে যাবে।

এখানে একটি ব্যাপার সবাইকে অনুধাবন করতে হবে। আমাদের মাঝে যে 'নফস' আছে তার ওয়াসওয়াসামূলক ভাষা আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাতে থাকে। আর এটা সুধারণা না কু-ধারণামূলক ওয়াসওয়াসা তা বুঝা আরও কঠিন যখন এই ভাষার শব্দাবলী বাহ্যিক জড়সম্পন্ন থেকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উপনিত হয়। অর্থাৎ আগে যেখানে ওয়াসওয়াসার অর্থ ভাষার মাধ্যমে সরাসরি বুঝা যেতো এখন তা সেরূপ নেই। আগের কুমন্ত্রণা মানুষ, জিন ও শয়তান যেভাবেই দিয়েছে তার একটি বাহ্যিক স্বরূপ ভাষার শব্দাবলী দ্বারা বিশ্লেষণ করা যেতো- বুঝা যেতো। কিন্তু এবার এসব খারাপ বিষয়বস্তু সরাসরি আত্মার মধ্যে জাগ্রত হবে- যার ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ করাও সময় সময় দুষ্কর হয়ে ওঠে। এসব কু-মন্ত্রণার লক্ষ্য হচ্ছে সালিককে পথভ্রান্ত করা, তার মুর্শিদের কাছ থেকে দূরে সরানো।

সালিক এসময় এমন সব বস্তু দেখতে বা বুঝতে পারে তাতে মনে হবে সে যেনো তার মুর্শিদের গোলাম সেজে গেছে। তার মুর্শিদ তাকে ব্যবহার করছেন। কিংবা সে জেলখানায় আছে। দুনিয়া তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই রাস্তায় চলে সে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি তার নিজস্ব স্বজনরাও তার প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন। ইত্যাদি বিষয় তার আত্মার মাঝে জাগ্রত হয়ে ওঠে। সে

যদি এসময় মুর্শিদের সান্নিধ্য বর্জন করে তাহলে তার বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ বাস্তবে যা ঘটছে তা মোটেই সে যা মনে করছে তা নয়- সে আসলে তার মুর্শিদ ও তরীকতের সালিকরা এ সময় তার জন্যে আরশি স্বরূপ যাতে তার নিজের মধ্যে তখনও বিদ্যমান খারাপ বস্তুসমূহ প্রতিবিম্ব হয় মাত্র।

এই অবস্থায় স্বয়ং ইবলিস তার সঙ্গে সংলাপে মত্ত হয়। সে বলে: "দেখো! তুমি তো সবকিছু দেখলে ও বুঝলে। এখন তুমি সবই জেনে নিয়েছো। তুমি তো বেশ জ্ঞানবান ব্যক্তি। তুমিই এখন নিজেই একজন মুর্শিদ! তোমার মুর্শিদ এখন অহেতুক তোমার উপর অতিরিক্ত কিছু বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন- যা তোমার মতো তরীকতের পথে উন্নত স্তরে আরোহণ-কৃত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা মোটেই জরুরী নয়। তিনি এখনও বুঝাতে চাচ্ছেন, তোমার চেয়ে তাঁর মাক্বাম অনেক উপরে! তোমার মাঝে কি কাশফ, কারামত ও ইলহাম প্রকাশ পায় নি বা পাচ্ছে না? এগুলো তো কামালতির প্রমাণ। সুতরাং তোমার মাক্বামও কম না! স্বয়ং আল্লাহ পাক এখন তোমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন! বাহ্যিক ঐসব আমলের আর প্রয়োজন কী? শুধু ফরয ওয়াজিব পালন করলেই হলো- কারণ তাযকিয়ায়ে নফস তোমার হয়ে গেছে! এখন শুধু অভ্যন্তরীণ কাজগুলো চালিয়ে গেলেই হলো- মুরাকাবা করো, আর তোমার মধ্যে যেসব গুপ্ত জ্ঞান আসছে ওগুলো বুঝার চেষ্টা করতে থাকো" ... ... ইত্যাদি।

সালিকের জন্য উপর্যুক্ত অবস্থা ঝড়-তুফানের মতো মারাত্মক। কারণ, শয়তানের এই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ ওয়াসওয়াসায় যদি সে আসক্ত হয়ে জালে আটকা পড়ে যায়- তাহলে আর সহজে মুক্তি পাবে না। সুতরাং মনের ভেতর উক্তসব খেয়াল জাগ্রত হয়ে উঠলেই তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা সাথে সাথেই নিতে হবে। আমল-ঈমানের প্রতি এবার আরও বেশী যত্নবান হতে হবে। বরং কষ্ট সহ্য করেও তা আরো বৃদ্ধি করা উচিত। সর্বোপরি স্বীয় মুর্শিদ বা শায়খের প্রতি মুহাব্বাত ও টান আগের চেয়ে আরও বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে হবে। তাঁর সুহবতে বেশী বেশী থাকা ও উপদেশ, নিষেধ, আদেশ ইত্যাদি মাথা পেতে মানা এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে- এ কথাটি অনুধাবন করতে হবে। এরূপ হলে পরে দেখবেন, মরদুদ শয়তানের সকল ওয়াসওয়াসা ব্যর্থ হবে।

এই স্তরে উন্নীত সালিকের অভ্যন্তরীণ অবস্থার আরও কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় দেখবেন, কোন ব্যাপার বুঝার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। মনে হবে, আগের তুলনায় অনুধাবন ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে। নতুন অনেক ব্যাপার প্রকাশ পাবে যা অতীতের ধারণাগুলোর সঙ্গে বেমানান লাগবে- এমনকি সাংঘর্ষিক বলে বোধগম্য হবে। সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত হাক্বিকাত প্রকাশ পাবে। এগুলো অবলোকন করে সালিক ভাববে, আমি সঠিক দেখছি তো? এমনকি সময় সময় সে এসব অবলোকন করে এতোই বিভোর হবে যে, মনে হবে সে জীবিত নেই- বা অস্তিত্বশীল আছে কি না সন্দেহ করবে। তখন শত শত খেয়াল আসবে যার কিছুটা অলীক ও কিছুটা সত্য। এমনকি এ খেয়ালও আসতে পারে যে, আমি ফানাফিল্লাহ হয়ে গেছি! আল্লাহর অস্তিত্বের মাঝে আমার বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা অনুভূতি মাত্র। ফানাফিল্লাহর উচ্চতর মাক্বাম এখনও হাসিল হয় নি। অবশ্য এসব অনুভূতির কথা স্বীয় মুর্শিদের কাছে বলতে হবে। এছাড়া এটা নিশ্চিত জেনে নিতে হবে যে, এসব চিন্তা মূলত এই স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাত্র। কারণ এ স্তরে এসে সালিক কোন কোন সময় সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব, শূন্যতা, পাওয়ার আগ্রহে ব্যকুল, ফকিরী (এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, সালিক দেখতে পায় নিজের দেহ-প্রাণসহ কোন কিছুর মালিক সে নিজে নয়- সে সত্যিকার অর্থে ফকীর বা নিঃস্ব) অবস্থা ইত্যাদি অনুভব করে থাকে। শেষোক্ত অবস্থা, অর্থাৎ ফকিরী ছিলো আমাদের প্রিয় নবীজীর প্রিয় জিনিস। তিনি বলেছেন, "আমি আমার ফকিরীর জন্য গর্বিত"।

এই অবস্থায় উন্নীত সালিককে কিন্তু মরদুদ শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সে তার সুযোগ তখনই পেয়ে যায় যখন সালিকের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকামসহ আমলী জিন্দেগীতে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সে তখন এসে খুব সুন্দর যুক্তি দ্বারা সালিককে দিগ্‌ভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হয়। সে অন্তরের মধ্যে যেসব ওয়াসওয়াসা ঢেলে দেবে তার একটি ফিরিস্তি এই: হে আমার শায়েখ! দেখ, এখন তো তুমি মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বামে পৌঁছে গেছো। তোমার সম্পর্ক এখন সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। তিনি যা করাতে ইচ্ছা তা তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। মুর্শিদের প্রয়োজন তোমার শেষ হয়ে গেছে। এখন শরীয়তের সকল কিছু তোমার জন্য মানাও জরুরী নয়। কারণ, তুমি ফানাফিল্লাহর স্টেজে উঠে গেছো- তোমার জন্য শরীয়তের প্রতিটি হুকুম-আহকাম

মানা অহেতুক প্রতিবন্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়! তুমি আল্লাহর ওলি হয়েছ। আর ওলিদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন- যদি তা না করতেন তাহলে তোমাকে এই উচ্চ মাক্বামে পৌঁছাতেন না। এখন তুমি তাঁর আর তিনি তোমার। তাঁর নিকট জবাবদিহিতার স্তর তুমি অতিক্রম করে ফেলেছ ... ইত্যাদি।

সব ভুয়া! আল্লাহ আমাদেরকে এহেন অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত রাখুন। শয়তানের উপর্যুক্ত ওয়াসওয়াসা এই স্তরে উন্নীত সকল সালিকের মধ্যে এসে থাকে। এ সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শরীয়তের পরিপন্থী একটি মাত্র খেয়াল আসলেই বুঝতে হবে এটা শয়তানের কাজ। সাথে সাথে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আজীম' পাঠ করুন এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এছাড়া এই খেয়াল মনের মধ্যে বদ্ধমূল করুন যে, নবী-রাসূল ছাড়া নিষ্পাপ কেউ নেই। আর বেহেশত কিংবা আখিরাতের মুক্তির গ্যারান্টি কখনও মিলবে না। একটি মাত্র পাপের কারণে পুরো জিন্দেগীর সবকিছু বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে তিনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেছেন- নিজের চেষ্টায় কেউ তা অর্জন করে নি। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখতেই হবে। ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত তো পরিত্যাগ চলবেই না- বরং নফল ইবাদাত তথা জিকির-আজকার আরও বৃদ্ধি করতে হবে। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও দয়ার শোকর আদায় করে কি কোন দিন শেষ করা যাবে? আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তরীকতের রাস্তায় চালিয়ে এই স্তরে উন্নীত করেছেন, তার শোকর হাজার হাজার বছরের হায়াত পেলেও দিনরাত শুকরিয়া জ্ঞাপন করে একটুও আদায় করতে সক্ষম হবেন না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

-"বলুন: আমার পালনকর্তার [অনুগ্রহের] কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে- সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।" [সূরা কাহাফ : ১০৯]

সুতরাং কখনও এটা মনে করবেন না যে, মুক্তি পেয়ে গেছি! মনে রাখুন, এই স্তরে এসে পৌঁছার মতো সৌভাগ্য আল্লাহর অনুগ্রহে অর্জিত হওয়ার পর, এখান থেকে অধঃপতিত হওয়া কোন উঁচু দালানের ছাদ থেকে মাটিতে পড়ার মতো দুঃখজনক ব্যাপার। এটা সত্যিই হৃদয়বিদারক। মারাত্মক। এতে অন্তর মরে যায়। আর যার হৃদয় নেই- তার মাঝে কিছুই নেই। সে যেনো এক শয়তানের পুতুল! সে চুরি করে, হত্যা করে, মদ খায়, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়; গোণাহ করার ক্ষেত্রে তার মাঝে কোন সীমানা নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে রেহাই দিন। আ-মিন।

কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, 'লা তাকনাতু মির-রাহমাতিল্লাহ' - 'আমার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না'। যারা নিজেদেরকে সকল প্রকার সতর্কবাণী শ্রবণ করে অধঃপতনের রাস্তায় চলা থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়, তাদেরকে আল্লাহ পাকই রক্ষা করেন। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার মাত্রা অসীম। তিনি তাঁর বান্দাকে রক্ষা করবেন- এই আশা ছাড়তে নেই। সুতরাং যারা তরীকতের রাস্তায় চলে নফসে মুলহিমাহর স্তরে এসে বিপদে পড়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে ও স্বীয় মুর্শিদের আদেশ-নিষেধ ও পরামর্শ মুতাবিক চলে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই দয়াপরবশ হয়ে পরবর্তী মনযিল তথা 'নফসে মুতমায়িন্নাহ'র স্তরে নিয়ে পৌঁছাবেন। যে স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনাবিল প্রশান্তি।

আশিকৌছে কিয়া মজা হ্যায়, মাশুকৌছে পুছিও,
বাগে গুলমে কিয়া মজা হ্যায় বুলবুলৌ কো পুছিও।

প্রেমের মাঝে কি সুখানুভূতি প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করো,
ফুলবাগানে কি মজা বুলবুলিদের জিজ্ঞেস করো।

চতুর্থ মনযিল ঃ নফসে মুতমায়িন্নাহ

সালিকের জন্য এ স্তরে পৌঁছা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট রহমত স্বরূপ। কারণ এ স্তরে এসে সে অনেকটা নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী স্তরসমূহে সে যে বিরাট চেষ্টা-সাধনা-কষ্ট সয়ে এসেছে এ স্তরে উন্নীত হওয়াটা তার সুফল। নফসে আম্মারার সার্বক্ষণিক কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের কাফিলা তাকে পথহারা করতে কতোই না চেষ্টা করলো! সালিক তার পীরের সান্নিধ্য ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মাধ্যমে ওদেরকে হারিয়েছে। অবশ্য প্রভুর একান্ত দয়া ছাড়া সে কিছুই পারতো না। নফস-রূপী শয়তান ও বাস্তব ইবলিস- এ উভয়কে পরাজিত করতে না পারলে কেউ এই উন্নত অবস্থায় আরোহণ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এ কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এখানে এসে নিরাপত্তায় প্রবেশ করার পর অবশ্যই আল্লাহর শোকর-গুজার শতগুণ বৃদ্ধি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

সালিক এ স্তরে পৌঁছে অনুভব করবে যে, সে তার স্বাভাবিক মানবিক রূহের নিয়ন্ত্রণে আছে। এই রূহানীর স্বভাব ধর্ম হচ্ছে দীনের যাবতীয় আহকাম মেনে চলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের উপর সুদৃঢ় থাকা। সালিকের মধ্যে এমন সব উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটে যা স্বয়ং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় ব্যাপার। কারণ এই মাকামের বৈশিষ্ট্যাবলী হলো: দয়ার্দ্রতা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীলতা, আন্তরিকতা, পরিতৃপ্তি এবং প্রশান্তি। সালিক আল্লাহ পাকের ঐ বাণীর হাক্বিকাত বুঝতে সক্ষম হয় এবং তা শ্রবণ করে, যেখানে তিনি ‘হে নফসে মুতমায়িন্নাহ্’ বলে তার প্রিয় বান্দাকে ডাক দিয়ে বলেন:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي

-"হে নফসে মুতমায়িন্নাহ! [যে প্রশান্তির নাগাল পেয়েছে] তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, তাঁর প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এবং আমার অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" [সূরা ফজ্‌র : ২৭-৩০]

সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি নফসে মুতমায়িন্নাহর স্তরে উপনিত হয়েছেন। কারণ তিনি অনাবিল প্রশান্তির নাগাল পেয়ে গেছেন। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই সেই চিরসুখের জান্নাতের সুখ-শান্তির ছোঁয়া তার অন্তপুরে এসে মনকে পুলকিত করে তোলে। সময় সময় শিহরণ জাগায় অন্তরাত্মায় খোদায়ী ইশকের চির-প্রশান্ত বিভোরতা। এসব আধ্যাত্মিক সুফল সালিকের অতীত জীবনের চরম কষ্ট-সাধনার প্রতিদান। দুনিয়ায় থাকতে এগুলোর নমুনা কিছুটা মাত্র প্রকাশ পায়। পুরো প্রতিদান তো বাকী থাকবে পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য।

নফসে মুতমায়িন্নাহর এই উন্নত স্তরে যে মহাত্মন আরোহণ করেছেন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে প্রতিটি শব্দ বের হয় কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক কিংবা হক্বপন্থী আওলিয়া-দরবেশদের অমর বাণী সম্বলিত উপদেশ বাক্য। তাঁর প্রতিটি কাজ হয় ইবাদতের। এতে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন। যতো বেশী ইবাদত করেন ততো বেশী স্বাদ অনুভূত হয়। তিনি শিক্ষাগুরুর মর্যাদা লাভ করেন- শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজেও। যেসব কারামত তার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে- তিনি এগুলো কখনও নিজের বলে দাবী করেন না। এমনকি এগুলোর প্রতি তাঁর তেমন খেয়ালই নেই। কারণ কারামত প্রকাশ হওয়া কামিল হওয়ার লক্ষণ নয়। যেমন কোন এক দরবেশ বলেছেন, 'কারামত প্রকাশ হওয়া ইলমে মা'রিফাতের রাস্তার প্রথম স্তর মাত্র'। সুতরাং কারামত প্রকাশের মাধ্যমে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে- এই যা। এটা কখনও পীরের পীরাকি বা তাছাওউফের স্তর নির্দিষ্ট করে না।

এই স্তরে আরোহণ করে সালিক তার প্রতিটি কাজ শরীয়ত মুতাবিক করেন। কারণ তিনি তো তার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। আর তা হলো, ইনসানিয়্যাত। সত্যিকার মানুষ। ইনসান শব্দটি 'উন্‌স' ধাতু থেকে নির্গত- যার অর্থ নৈকট্য অর্জন। আর খাস করে প্রভুর নৈকট্য হাসিল। সুতরাং নৈকট্য অর্জন করার পর সালিক অনেকটা নিরাপদ। এবার তার রব তাকে হাতে ধরে পরবর্তী

মাক্বামে টেনে নিবেন। সালিকের এই ভ্রমণে আর তেমন বেশী পথের কাটা থাকবে না- যা তাকে কষ্টে পতিত করতে পারে, কিংবা ফিরাতে পারে। এখন থেকে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া, মুহাব্বাত ও নৈকট্যশীল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে এই স্তরে উন্নীত হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না।

“সুফি শায়খরা নিজের অভিজ্ঞতাকে ক্ষুদ্র ধূলোবালির মতো অনুভব করেন, যা আলোকিত হয়ে দৃষ্টিগোচর হয় সূর্যের রশ্মি দ্বারাঃ এ ধূলোবালি না বাস্তব না অবাস্তব।”

- শাদিলিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবুল হাসান শাদিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পঞ্চম মনযিল ঃ নফসে রাদ্বিয়্যাহ

অবশ্যই, খুব অল্প ব্যক্তি এই উচ্চতর মাক্বামে পৌঁছতে সক্ষম হন। এই স্তরসহ যাবতীয় স্তরসমূহ অতিক্রম কালে সালিকের মধ্যে ইলমে মা'রিফাতের যেসব জ্ঞান এসেছে তা শব্দ, বাক্য, উপদেশ এবং অন্যের অনুসরণের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। এভাবে জ্ঞানার্জনকে সমষ্টিগতভাবে 'ইলমুল ইয়াক্বিন' বা অর্জিত জ্ঞান বলে। যেমন মনে করুন, আপনার শায়খ আপনাকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জিকির-আযকারের সবক দিলেন। আপনি তা সঠিকভাবে পালন করলেন ও এতে আপনার মধ্যে যিকিরের ফায়দা হাসিল হলো। আপনি জিকির করা হেতু যিকিরের হাক্বিকাত সম্পর্কে অবগত হলেন। এই জ্ঞানার্জন ইলমুল ইয়াক্বিনের অন্তর্গত- কারণ, আপনি যদি জিকির না করতেন তাহলে এই জ্ঞানের সন্ধান আপনি কখনো পেতেন না। আরও দৃষ্টান্ত হলো এই লেখাটুকু পাঠ করা। এটা পাঠ করে আপনি মা'রিফাতের স্তর-সমূহকে কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। আর যদি কিছুটা জ্ঞান সত্যিই এই লেখা পাঠের ফলে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে- তাহলে তা অবশ্যই অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু জ্ঞানার্জন শুধু এভাবেই হয় না।

ইলমুল ইয়াক্বিন ছাড়া উচ্চতর পর্যায়ের আরও একাধিক ধরনের জ্ঞান আছে যার একটি হলো 'আইনুল ইয়াক্বিন' বা নিশ্চিত জ্ঞান। এই জ্ঞানার্জনের মূলে হলো অভিজ্ঞতা। এটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতা ও ঐশী ইশারার মাধ্যমে মা'রিফাতের সালিকের দিলে এই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ইতোমধ্যে অর্জিত সকল জ্ঞান ছিলো আপেক্ষিক- কিন্তু এখন যা আসবে তা সবই হাক্বিকাত বা সত্যোপলব্ধির অন্তর্ভূক্ত।

এই স্তরে এসে সালিকের কাছে যে জিনিসটি অধিক প্রকাশ-বিকাশ ও প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলো ইশ্‌ক আর ইশ্‌ক। সবকিছুর মাঝে তিনি খোদায়ী ইশকের প্রভাব ও ছোঁয়া প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহর প্রতিটি কার্যে এই প্রেমের ছোঁয়া দেখে সালিকের মন আরও গভীরভাবে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভের আশায়

বিভোর হয়ে ওঠে। তিনি দেখতে পান 'আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ' ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আর এটাই ইসলামের আসল হাক্বিকাত। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। সালিক দেখতে পান অ-কলুষিত পবিত্র অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করছে। এখানে পৌঁছার পর বিপথগামিতার কোন সম্ভাবনা বাকী নেই। কারণ, তিনি তো তার নফসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন। বাস্তবে তার নফস বা 'নিজ' এখন মুসলমান হয়ে গেছে!

সালিক এখন তার প্রতিপালকের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন। তার যা আছে তা-ই পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং আল্লাহর দরবারে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়েছেন। আর এর ফলে আল্লাহ্ পাক অন্যের জন্য যে দু'আ তিনি করবেন তা কবুল করে থাকেন। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। মহান আরশের অধিপতির কাছে এই মহাত্মন সবদিক থেকে সফল। কারণ তাঁকে আল্লাহ পাক আপন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর আত্মসমর্পণ, প্রভুর যে কোন ফায়সালায় সন্তুষ্টি, শোকর এবং ইশ্‌ক সবই বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সুতরাং মহান দয়ালু আল্লাহ পাক তাঁর এ বান্দার ডাকে সাড়া দেন। তিনি তাঁকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যান নিজ ইচ্ছায়। সে স্তরের নাম নফসে মারদ্বিয়্যাহ।

"যারা তাসাওউফের কথা শ্রবণ করে এবং এর আমলে লেগে যায়, ফলে তাদের হৃদয়ে এটা হয়ে যায় জ্ঞানের প্রস্রবন। তাদের বাণীও ওদের জন্য উপাকারী যারা শ্রবণ করে। কিন্তু যারা তা শ্রবণ করেও আমলে পরিণত করে না, তাসাওউফ তাদের জন্য শুধু বাক্যাবলী যা ক'টি মাত্র দিবস শেষে বিস্মৃত হয়ে পড়ে।"

- শায়খ শাহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ষষ্ঠ মনযিল ঃ নফসে মারদ্বিয়্যা

এ স্তরে উন্নীত সালিকের মধ্যে শক্ত একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যার মূল হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টি। আর এ দু'য়ের মধ্যকার সম্পর্ক যে মূলত প্রেম- তা সালিকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। অপরদিকে মহান আরশের অধিপতি সালিকের মধ্যে জ্ঞান নিক্ষিপ্ত করে দেন যে, তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠেছে। যেমন তিনি বলেন: অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি ...।

সালিকের মাঝে আল্লাহর পবিত্র সুন্দরতম নামের হাক্বিকাত প্রকাশ পায়- যেসব নামের হাক্বিকাত আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস্‌সালম এর কাছে প্রকাশ হয়েছিল। এ স্তরে উন্নীত সালিক মূলত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া তার মাঝে আর কোন কিছুর কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এখন তার 'আমিত্ব' সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মাঝে আর খেয়ালই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহর পরিচিতি বা মা'রিফাতের আসল স্বরূপ তার মাঝে উন্মোচিত হয়। তিনি দেখতে পান আল্লাহর অস্তিত্বই চিরসত্য। বাস্তবে তিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে পুরো অস্তিত্বশীল বা স্থায়ী বলতে আর কিছুই নেই। অবশ্য এটা তো সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার যে, যে জিনিস অস্থায়ী তার মূল্যও অস্থায়ী। অন্য কথায় এসব বস্তুকে নকল বলা চলে। আসল তো সেসব জিনিস যার গুণাবলী ও স্থায়িত্ব চিরন্তন- আর এ সত্য একমাত্র মহাল আল্লাহর জন্যও খাস। তিনি বলেছেন: সবকিছু বিলুপ্ত হবে বাকী থাকবেন শুধু তোমার মহান প্রতিপালক- যিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী।

হাক্বিকাতের নূরে সম্পূর্ণরূপে ভাসমান এই সালিক ইনসানে কামিলের মাক্বামে পৌঁছে গেছেন। কারণ তাঁকে আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে হাক্কুল ঈমান ও আইনুল ইয়াক্বিন দ্বারা ভূষিত করেছেন। সবকিছুর মধ্যে তিনি সবকিছু দেখেন, সবাইকে ভালোবাসেন, যারা জানে না তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন, তিনি করুণাময়, দয়ালু, দাতা, সৃষ্টির কাছে অমুখাপেক্ষী, অপরকে অন্ধকার থেকে হাক্বিকাতের নূরে আলোকিত করতে সদা-সচেষ্ট। তিনি যা কিছুই করেন সবকিছু

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেন। আর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁকে পর্যাপ্ত রিযিকসহ সম্পূর্ণরূপে দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে আপনার এরূপ সৌভাগ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। যাঁদের হিফাজতের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আপনি বলেছেন, ওতারজুকু মানতাশা-উ বিগ্বাইরি হিসাব- আমি যাকে ইচ্ছে বে-হিসাবি রিযিক দান করে থাকি।

অবশ্য নফসে মারদ্বিয়্যাহ স্তরে উন্নীত মহাত্মনদের অধিকাংশই আমাদের মাছে আত্মগোপন করে আছেন। তাঁদেরকে চেনা সহজ ব্যাপার নয়। এসব ওলিরা সর্বত্রই বিরাজ করছেন, কিন্তু কে কোন অবস্থায় সর্বসাধারণের মধ্যে মিশে চলাফেরা করেন তার খবর কেউ রাখে না। অবশ্য তাঁদের কিছু উত্তম গুণাবলী আছে যা থেকে তাঁদের পরিচিতি সময় সময় উন্মোচন হয়। এর মধ্যে ক'টি হলো:
১. তাদের মধ্যে দেখা যায় সর্বদাই একটি ভারসাম্যতা বিরাজমান। সব সময় তাঁরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। বেশিও নয় কমও নয়- উত্তম ভারসাম্যতা। যেমন একটি দাঁড়িপাল্লার ব্যালান্স যেভাবে নির্ভরশীল তার আলম্বের উপর- এরা ঠিক তা-ই। আর এই ভারসাম্যতা মধ্যম পন্থা অর্জনের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছে, আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এটাকে উত্তম রাস্তা বলেছেন, আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা তা অর্জন করার। কিন্তু একমাত্র এই স্তরে উন্নীত আল্লাহর ওলিরা ছাড়া কেউ তা বাস্তবে অর্জন করতে সমর্থ হয় না।

নফসে মারদ্বিয়্যার মনযিল সর্বশেষ স্তর নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তরীকতের সালিককে তিনি নৈকট্যের শেষ প্রান্তে নিয়ে পৌঁছান। মানুষ হিসেবে যে মাক্বাম পর্যন্ত অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখান পর্যন্ত তিনি তাঁর ইচ্ছায় স্বীয় ওলিকে নিয়ে যান। আর এই সর্বোচ্চ মাক্বাম বা স্তর হচ্ছে 'নফসে সাফিয়্যাহ'। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে বঞ্চিত করবেন না। আপনার মা'রিফাতের নূরের দরিয়ায় না ভাসিয়ে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেবেন না।

"যে কেউ নীরবতা পালন করলো, সে মুক্তি পেলো।"
-আল-হাদীস - মুসনাদে আহমদ

সপ্তম মনযিল ঃ নফসে সাফিয়্যাহ

এই সর্বশেষ স্তরে উন্নীত আত্মা সত্যিই তার আসল স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। করণ সে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক গন্তব্যস্থল তথা কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেছে। এই একক কেন্দ্র হচ্ছে এমন একটি বিন্দু যার না আছে কোন দৈর্ঘ্য না প্রস্থ, এমনকি তার বিস্তৃতিও নেই। এটা নিষ্কলুষ পবিত্রতা। এখানে কোন ইচ্ছে নেই, না আছে দাবী- এটাই শুরু ও এটাই শেষ। এটা যেন 'বা' হরফের নীচের ফোটা এবং 'নুন' এর উপরের। যাবতীয় জ্ঞান এ উভয়ের মধ্যে বিরাজমান। এই স্তরে উন্নীত পবিত্র আধ্যাত্মিক সত্ত্বা যখন নড়ে তখন তাঁর এ নড়াচড়া ক্ষমতাধর বদান্যতা; যখন তিনি কথা বলেন, তা হয় এমন প্রাঞ্জল ও প্রজ্ঞাময় যেনো তা কর্ণ-কুহরে মিষ্টি-মধুর সুর; যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি দর্শনকারীর কাছে সৌন্দর্য ও মহানন্দের কারণ। তাঁর দেহকাঠামোর প্রতিটি অণু-কণা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল- প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে। সবকিছুতে ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ! আল্লাহ! হু! হু!'। তাঁর আনন্দের কারণ একমাত্র প্রতিপালকের নৈকট্য- তিনি চান জগতের প্রতিটি মানুষ এ নৈকট্য হাসিলে ধন্য হোক। দোযখের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড যেনো তাদের একটি পশমও জ্বালিয়ে দিতে না পারে। মানুষের বিপথগামিতা তাঁর হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতের অনুসরণ তাঁকে করে পুলকিত, আনন্দিত, প্রশান্ত।

তাঁকে আল্লাহ পাক স্বীয় নৈকট্যের মর্যাদা দানে ধন্য করেছেন। এরপরও তাঁর মাঝে ইবাদাতে কোন শৈথিল্য নেই। তাঁর মস্তক সদা-নত মহান আরশে আজীমের পদতলে। রাতের গভীরে তাঁর চোখে অশ্রুর বারিধারা। তাওবাহ্ আর তাওবাহর অশ্রুতে ভেজা তাঁর নয়ন-যুগল। তাঁর বাঁচার খোরাক এই অশ্রুর ঝরনা। তাঁর আনন্দ মানবের মুক্তি- তাঁর ভীষণ বেদনা মানুষের পথভ্রষ্টতা। তিনি সেই ব্যক্তিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু করে- আর ভীষণ রাগান্বিত তার প্রতি যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছে। মানবজাতির জন্য স্বয়ং আল্লাহ যা চান তিনিও তা-ই চান। তিনি সর্বদাই অবিশ্বাসীদের শেষ, করুণ পরিণতির জন্য ভয় পান। তিনি ন্যায়পরায়ণ- তার

চেয়েও উত্তম। তাঁকে আল্লাহ পাক রোজ কিয়ামতে সুপারিশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এরপর আর বলার নেই। কারণ, একমাত্র আল্লাহ পাকই অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই সবকিছু ভাল জানেন। তাঁর পবিত্র দরবারে আবদার: আমাদেরকে সরল সঠিক পুণ্য পথে পরিচালিত করে ইলমে মা'রিফাতের সর্বোচ্চ মনযিলে উপনিত করুন যা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য। এ রাস্তায় চলতে আমাদেরকে মুর্শিদে কামিলের সাহচর্য, ধৈর্য, অধ্যবসায়, শক্তি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা ভূষিত করুন। আ-মিন, ছুম্মা আ-মিন।

... وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ...

- "... কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের ভালোবাসা আরো গভীর ... ।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৬৫]

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সুবিদ বাজার, সিলেট।
শাওয়াল ১৪৩৫ হিজরী, আগস্ট ২০১৪।